দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 10/3/78 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 4 ...

আবুল কালাম শামসুদ্দীন : একটি নাম একটি ইতিহাস

আমরা তাঁকে বলতাম 'এডিটর সাহেব'। এই সম্বোধনটিকে ঘিরে যে ব্যক্তি মানুষটি তাঁর সঙ্গে মিল খুঁজে পাই না আর কারও। চোখে কালো ফ্রেমের চশমা। গায়ে সাদা পাঞ্জাবি। সাদা পায়জামা। মাথা জুড়ে ধূসর শুভ্রতা। মাঝখানে কিছু চুল কালচে ছাঁট। আশ্চর্য রকমের প্রশান্ত, উজ্জ্বল মুখ। একটি সরলতা উৎকীর্ণ সারাটা মুখে। এই সরলতা তুলনীয় অপাপবিদ্ধ শিশুর সরলতার সঙ্গে। তাঁর হাসিতে ছড়ানো ছিল বিশাল একটি প্রাণের সমস্ত সৌরভ এবং অজস্রতা। তাঁর সম্ভাষণের ভাষা বিমুগ্ধ করতো দূরের কিংবা কাছের যে-কোনো লোককে। মানুষকে কাছে টানার এমন ক্ষমতা আর কারও মধ্যে দেখেছি বলে মনে হয় না। সম্ভ্রমবোধে, শিষ্টতায় এবং সৌজন্যে তাঁর তুলনা বিরল। অথচ সাংবাদিক জগতে তিনি ছিলেন কিংবদন্তীর নায়কের মত খ্যাতিমান এক অসামান্য ব্যক্তিত্ব। আবুল কালাম শামসুদ্দীন—এই নামটি বহু যুগ ধরে উচ্চারিত আমাদের ঘরে ঘরে। শৈশব-স্মৃতিতে খোদিত তাঁর নামের শব্দময় ব্যঞ্জনাগুলি।

পরিচয়ের আগে মনে হয়েছে তাঁর অধিষ্ঠান এমন এক চূড়ায় যেখানে আমাদের মত লোকের প্রবেশ অসম্ভব। সাংবাদিকতার সৌরমন্ডলে তিনি ছিলেন সব থেকে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। মধ্যাহ্ন সূর্যের মত প্রখর প্রভায় আলোকিত করছিলেন আমাদের ভাবনার অন্ধকার আঙিনা। এখানে তাঁর অবস্থান একটি গোটা শতাব্দীর অর্ধাংশ জুড়ে। এই জাতির যখন রাজনীতিতে অস্থিরতা এবং বুদ্ধির জগতে সংকট সেই মুহূর্তে জাতীয় সাংবাদিকতায় তাঁর আবির্ভাব। তিনি তখন উত্তর-কৈশোরের এক নব্য যুবা। বিদ্রোহী নজরুল ইসলামের মতই যৌবনের উদ্দামতা এবং প্রাখর্য ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বে, তাঁর প্রতিভায়। বুদ্ধির গভীরতা আর তীক্ষ্ণতা স্থিরতা দিয়েছিল যৌবনের সেই প্রচন্ড শক্তিকে। তাঁর বলশালী লেখনীতে এই সংযত অথচ সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞার প্রকাশই আমরা লক্ষ্য করে এসেছি এই শতাব্দীর বিশ দশকের সূচনা পর্ব থেকে। একটানা পঞ্চাশ বছর ধরে কলম চালনা করে এসেছেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। এই পঞ্চাশ বছরে প্রৌঢ়ত্বের ক্লান্তি, শ্রমের গুরুভার কিংবা বার্ধক্যের অবসাদের কাছে পরাভব তিনি স্বীকার করেননি। প্রাণের বৈভবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত উজ্জ্বল ছিলেন তিনি। সাংবাদিকতা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ভান্ডারকে প্রায় সমানভাবে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন চিন্তার ফসলে। তাঁর সাবলীল ভাষা-সম্পদ এবং মননশীল রচনা সম্ভার নতুন একটি ধারার জন্ম দিয়েছে সাংবাদিকতা-সাহিত্যে। যে-কোনো একটি বড় ঘটনাকে অমন ঋজু এবং তীক্ষ্ণ ভাষায় বিশ্লেষণের ক্ষমতা কম সাংবাদিকের মধ্যেই দেখা যায়। এই একটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর শ্লেষাত্মক সমালোচনা মর্মস্থল বিদ্ধ করার ক্ষমতা রাখতো।

এমন অজস্র লেখা আর কোনো কলমের মুখ থেকে আমরা পাইনি। কেবল সৃষ্টির অজস্রতার দিক থেকেই নয়, সাংবাদিক হিসাবে কর্তব্য পালনেও তাঁর তুলনা বিরল। সংকটের দিনে জাতি এবং সাংবাদিকতাকে তিনি অনুভূতির অভিন্ন একটি প্রবাহে এনে যুক্ত করে দিয়েছেন। দিয়েছেন এই দুই মিলিত প্রবাহকে সাহসিক নেতৃত্ব এবং সঠিক পথ-নির্দেশ। তিনি কেবল জাতীয় সাংবাদিকতারই পথিকৃৎ ছিলেন, ছিলেন জন-চিত্তজয়ী এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এ কারণেই বিপরীত স্রোতের মুখে এমন নিষ্কম্প পদচারণায় দন্ডায়মান হওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল। অসাম্য এই প্রভাবের বলেই জনগণকে তিনি টেনে আনতে পেরেছিলেন সাংবাদিক বিবেকের সঙ্গে একাত্ম এবং একীভূত হতে।

আমরা যাকে বলি বিবেকী কন্ঠস্বর, এই সাংবাদিক পুরুষটি ছিলেন তার এক মূর্ত প্রতীক। জীবনে কখনও তিনি আপোস করেননি বিবেক-বিরোধী শক্তির সঙ্গে। তাঁর চিন্তা শাসিত ছিল মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা। জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন সাংবাদিক ব্রতের প্রতি উৎসর্গীকৃত, ছিলেন এই 'চতুর্থ রাষ্ট্রের' অনুশাসন এবং স্বাধীনতার এক পরম বিশ্বস্ত অগ্রনায়ক।

সাংবাদিকতায় বিবেকী মূল্যবোধের যে অনন্য দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন, তা তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে সাংবাদিকতার ইতিহাসে। এবং একই সঙ্গে জাতির ইতিহাসেও। গণতান্ত্রিক চেতনা এবং চিন্তার স্বাধীনতার প্রজ্বলন্ত স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন জাতীয় জীবনের চারটি ঐতিহাসিক ক্রান্তি মুহূর্তে। এর একটি হল, ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। ঢাকার ছাত্রসমাজ তখন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবীতে সোচ্চার। দৈনিক আজাদ তখনও কলকাতায়। তিনি আজাদ সম্পাদক। এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে যুক্তিনিষ্ঠ সমর্থন ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা বাংলার সপক্ষে। এই জোরালো এবং দ্ব্যর্থহীন সমর্থন ভাষা আন্দোলনকে সেদিন কী প্রবল শক্তি যুগিয়েছে আমরা তা অনুভব করেছি আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে। যুব সমাজের অন্তরে সেদিন থেকে চিরস্থায়ী সম্ভ্রমের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন তিনি।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারীর চেতনার সঙ্গে একটি বিশুদ্ধ কীর্তির মত ভাস্বর হয়ে থাকবে তাঁর নাম। তিনি তখন একই সঙ্গে আজাদ সম্পাদক, আইন পরিষদ সদস্য, লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি আর দলীয় সভা। রাষ্ট্রভাষার দাবীতে আয়োজিত ছাত্র-শোভাযাত্রার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের সংবাদ কানে গেল তাঁর। স্থির থাকতে পারলেন না তিনি। মুহূর্তে বিদ্রোহী হয়ে উঠলো তাঁর সাংবাদিক বিবেক। ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে তিনি ত্যাগ করলেন পরিষদ সদস্যপদ। ছিন্ন করলেন মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর সবরকম সম্পর্ক। তারপর থেকে আর কখনও তিনি রাজনীতিতে ফিরে যাননি। পরিষদ সদস্যপদ বর্জনপত্রে তীব্র ভাষায় তিনি ক্ষমতাসীন সরকারের দমননীতি এবং ভাষাবিরোধী অ-গণতান্ত্রিক কার্যকলাপের সমালোচনা করেন। বিবৃতিতে বলেন, এমন নিষ্ঠুরতার পর যে-কোনো বিবেকবান মানুষই এ ধরনের সরকারের সাথে বিন্দুমাত্র সংশ্রব রাখতে ঘৃণাবোধ করবেন। সেদিন তাঁর অগ্নিক্ষরা শব্দমালায় লিখিত তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধের ভাষা ছিল বিবেকের উচ্চ নিনাদিত স্বর। সুতীব্র শ্লেষে ক্ষত-বিক্ষত করেছিলেন তিনি স্বৈর শাসকদের। আর একই সঙ্গে নিষ্কম্প বরাভয় মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করেছিলেন ভাষা-সংগ্রামী যুবকদের। জনচিত্তকে নাড়া দিয়ে টেনে এনেছিলেন সংগ্রামের পথে। শ্রদ্ধাবনত ছাত্র সমাজ মহান জাতীয় মনীষা এবং যোগ্যতম দেশ-নেতা হিসাবে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালো জীর্ণ ইটে গাঁথা প্রথম শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্যে। সাংবাদিক হিসাবে তাঁর এই সাহসী ভূমিকা গরীয়ান করেছে জাতীয় সাংবাদিকতাকে। গৌরবান্বিত করেছে এই পেশার প্রতিটি কর্মীকে। আবুল কালাম শামসুদ্দীনের এই অবদানের ঋণ আমাদের কারও পক্ষেই শোধ করা সম্ভব হবে না।

১৯৬২ সালে যখন সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বিপন্ন, তখন আবার তাঁকে আমরা দেখলাম বিবেকের শাণিত হাতিয়ার নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতে। ঢাকার রাজপথে মিছিলের পুরোভাগে তিনি। একালের তরুণ সাংবাদিকরা সেদিন হতবাক হলেন, বর্ষীয়ান অগ্রচারণের সংগ্রামী ব্যক্তিত্বের তেজস্বিতায়। বাক-স্বাধীনতার এবং পেশাগত প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে ওই বৃদ্ধ বয়সেও নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন তিনি। ১৯৬৯ সালে আবার তিনি এলেন জনগণের সংগ্রামী অভিযাত্রার সামনে। সরকারের গণনির্যাতনের প্রতিবাদে বর্জন করলেন সরকারের দেয়া খেতাব।

এই মানুষটিকে ঘিরে চার যুগ ধরে গড়ে উঠেছিল সম্ভ্রম মিশ্রিত একটি বিস্ময়। এ কারণেই প্রথম মনে হয়েছিল তিনি বুঝি আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু প্রথম পরিচয়ের দিনেই অবাক হয়েছি। সেটা ১৯৪৬ সাল। কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডের আজাদ অফিসে সেই প্রথম দেখা। তখন আমি ছাত্র এবং সাংবাদিকতার এক মুগ্ধ অনুরাগী। সালাম দিতেই হাসি মুখে যেভাবে সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন, তা আজও উৎকীর্ণ আমার স্মৃতিতে। মনে হয়েছিল অন্তরঙ্গ কোনো সহচরের সান্নিধ্যে এসেছি। কল্পনাও করতে পারিনি দেশজোড়া খ্যাতিমান এত বড় একজন সম্পাদক এমন সস্নেহ সম্ভাষণে কাছে টেনে বসাবেন। চা পানে আপ্যায়িত করবেন। নিজ হাতে লিখে দেবেন প্রার্থিত ঠিকানা।

ঢাকার জীবনে আরও অনেক ঘনিষ্ঠ হয়েছি তাঁর সঙ্গে। প্রতিটি সাক্ষাৎই তাঁর সরল অথচ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ছাপ ফেলেছে অনুভূতিতে। দৈনিক বাংলায় একটানা সাত বছর সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেছি তাঁর সঙ্গে। তাঁকে বলতাম এডিটর সাহেব। মনে হয়েছে আজন্ম এই একটি মাত্র পরিচয় নিজের সমগ্র অস্তিত্বে তিনি ধারণ করে রেখেছিলেন। সম্পাদক বলতে যে মহৎ, নিরহংকার, প্রফুল্লচিত্ত একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এবং মার্জিত রুচির প্রকৃত একজন ভদ্রলোককে বোঝায়, আবুল কালাম শামসুদ্দীন ছিলেন আমাদের কাছে তার এক সাক্ষাৎ প্রতিচ্ছবি। তাঁর কক্ষ ছিল একটি আনন্দগৃহ। আর তাঁর সান্নিধ্য ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। মত-পার্থক্যকে কখনও তিনি বড় মনে করতেন না। লেখাটা স্বচ্ছন্দ এবং হৃদয়গ্রাহী হলে তার কদর ছিল তাঁর কাছে সব থেকে বেশি। দৈনিক বাংলায় পাশাপাশি তিনি ছেপেছেন স্বমতের এবং ভিন্ন মতের লেখা। একজন খাঁটি সাংবাদিকের পক্ষেই মনের এমন প্রকান্ড ঔদার্য সম্ভব।

তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে সাংবাদিকতার সন্তান এবং তার মহান অগ্রচারণ। এশিয়ার অবিস্মরণীয় প্রতিভাধর সাংবাদিকদের অগ্রসারিতে তাঁর স্থান। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম যুগে তাঁর আবির্ভাব। সেই সংগ্রামের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি আমাদের এই জাতির জাগরণের অন্যতম তূর্যবাদক। নজরুল ইসলাম কবিতায় বিদ্রোহ সৃষ্টি করে আমাদের জাগিয়েছিলেন। আর আবুল কালাম শামসুদ্দীন সাংবাদিকতায় বিবেকের মশাল জ্বালিয়ে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন আপন উর্জাবনের সংগ্রামে। তাঁর তিরোধানে উনিশ এবং বিশ শতকের একটি বিশাল উত্তরাধিকারের অবসান হল। যবনিকাপাত হল সাংবাদিকতার ক্লাসিক্যাল যুগের। কিন্তু আবুল কালাম শামসুদ্দীনের স্মৃতি কখনও ম্লান হবে না। নক্ষত্রের মত চিরদীপ্যমান থাকবেন। তিনি জাতির ইতিহাসে। অনির্বাণ হয়ে তাঁর প্রেরণার শিখা জ্বলবে জাতির চিত্ততলে। অশ্রুসিক্ত নেত্রে তাঁকে স্মরণ করি।

...সানাউল্লাহ নূরী